অন্তর্জগতের কবিতা—'অম্লানের অনুভূতিমালা'

সুতপা ভট্টাচার্য

বাইরের জগৎ আর ভিতরের জগৎ—যে-কোনো মানুষই হয়ত এই দুই জগতের অধিবাসী, কিন্তু সকলের বাঁচায় এই দুই জগতের মাপ সমান নয়। আজ, বিশ শতকের শেষের এই সভ্যতাবিশ্বে, অধিকাংশ মানুষের কাছে বাইরের জগৎ-ই প্রধান, এমনকি একমাত্র, অন্তর্জগতের অস্তিত্বও টের পায় না অনেকে। পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে যারা বস্তু-আহরণে ব্যস্ত, এ ওকে ঠেলে যারা এগিয়ে চলেছে, কিংবা পথ করতে পারছে না প্রাণান্ত প্রয়াস করে চলেছে—তাদের কাছে বাইরের জগতের মাপ অনেক বড়ো, বাইরের জগতের দাবি অনেক বড়ো। যে-কোনো শহরে যে-কোনো গ্রামে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই জনতা বা জনতার পিতা।

কেউ-কেউ শুধু জানে অন্তর্জগতের সন্ধান, কারো-কারো কাছে অন্তর্জগৎটাই প্রধান, কারো কাছে বা একমাত্র। বাইরের জগৎ আমাদের চলা-ফেরার আমাদের আচরণের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারিতা দাবি করে, অন্তর্জগতের মানুষের কাছে সে নিয়মানুসারিতা অর্থহীন। তার কাছে বাস্তবের তাৎপর্যই ভিন্ন। ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে রাতের স্বপ্ন অধিকাংশই ভুলে যাই আমরা, যদি বা মনে থাকে—জানি, তার মানে হয় না কোনো। ঠিক তেমনই, ঘুমের জগতে প্রবেশ করি যখন, তখন দিনের যা-কিছু, সবই মনে হয় ভুল, অর্থহীন। তাহলে কী করে বলব, বহির্জগতের বাস্তবই ঠিক, আর অন্তর্জগতের বাস্তব ভুল?

অন্তর্জগতের এই বাস্তবতার কথাই পাই বিনয় মজুমদারের কবিতায়:

'হে কেশর, হে পরাগ, আমাদের চারিপাশে পরিকীর্ণ এই
বাস্তবের মতো হয়ে, বাস্তব-বিশ্বের মতো হয়ে আমাদের

.....

মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে মানসের বিশ্বও বাস্তব।
যত বেশি স্পষ্ট করে মানসনেত্রের মাঝে কল্পনাকে দেখি
ঠিক তত স্পষ্ট এক বাস্তব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয়ে থাকে।
মানসনেত্রের দেখা দৃশ্যই এ-বাস্তবের দৃশ্যাবলী হয়,
সেই হেতু এ-অম্লান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।'

'অম্লানের অনুভূতিমালা' থেকে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি, যে বইকে বলা যায় অন্তর্জগতের কবির এক ভাবনা-দলিল—বিনয় মজুমদারের মতো একজন অন্তর্জগতের কবির। অন্তর্জগতের বাস্তবতা যে কবিমাত্রেরই নির্ভর, তা বলা চলে না মোটেই। অধিকাংশ কবির অধিকাংশ কবিতাতেই বহির্জগতের দখলদারিই প্রধান। সমাজ-বাস্তবতার কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা বহির্জগতের অভিজ্ঞতাকেই মূর্তি দেয়। এমন কবিতা-বই কমই

পড়েছি, যেখানে বহির্জগৎ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেই বিরল বইয়েরই একটি 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা'।

'ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?' এই সুধিত প্রশ্ন রেখেছিলেন এই কবি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে। সে বইতে, নামেই প্রমাণ, নির্দিষ্ট এক মানবী রয়েছেন ভালোবাসার আলম্বন। 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা' বইতে পঞ্চশর দগ্ধ হয়ে সারা বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে যেন—বিশ্বপ্রকৃতিতে, তা যে-ভাবে মুকুরিত সেই মানসনেত্রে! তাঁর অন্তর্জগতের অভিক্ষেপেই গড়ে-ওঠা এই প্রকৃতিলোক।

ক. 'কী সুন্দর এ-নিসর্গ, মিলে-মিশে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া সেতু'।

খ. 'ক্রিসেনথেমাম ফুল—ফুলে-ফুলে একাকার ভোরের কেয়ারি;
একটি নিটোল গোল পরিধিতে পড়ে আছে শীতের রোদ্দুরে।
জন্মমরণের কথা ভুলে গিয়ে আদরের কথা ভুলে গিয়ে
এর পাশে ব'সে পড়ি, অনেক রকম সব রঙের নিকটে'।

গ. 'অরুন্ধতী তারাটিকে খুব বেশি ভালোবাসি যদিও সে অঙ্গারার চেয়ে বেশ ছোটো
আকারে সে খুব বেশি ছোটোই তো, তবু এই ঘ্রাণময় অরুন্ধতী বেশি ভালো
লাগে।'

ঘ. 'দেখা যায় একা-একা অজ্ঞানের জোছনায় আমি ও বকুল,
বকুলের ফাঁকটির চারধারে সরু-সরু পাপড়ি ছড়ানো
অতি সোজা সাদা কথা যেন অবিশ্বাস্যরূপে প'ড়ে আছে তবু—
তবু এ তো ডাল নয়, তবু এ তো পাতা নয়, এ হ'লো বকুল।'

তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রায়শই যে জড়িয়ে থাকে যৌন-ইশারা, সে বিষয়ে কবি যথেষ্টই সজাগ। তিনি জানেন তিনি 'অন্ধকারে চোখ খুলে সবচেয়ে ভালোভাবে' দেখেন: যৌনাঙ্গের 'একক একাধিপত্য' কবি মেনে নেন, মেনে নেন 'অবচেতনার রূপ'। সেই অবচেতনার রূপের নিরর্গল উৎসার এ কাব্যের অনেকখানি জুড়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু সবটা জুড়ে নয়। শুধুই অবচেতনা নয়, কখনো বা কবির 'সচেতনতা যেন অতিচেতনার সমপরিমাণ হয়ে যায়'। অন্ধকারের পাশাপাশি থাকে আলোর কথা: 'আঁধারের নিচে শুয়ে আরো আলো খুঁজে যেতে এত ভালো লাগে'। কবি নিজেই জানেন তাঁর কাব্যে—

'উভয় চেতনা যেন সমান কুশলী হয় সমান সক্ষম হয়ে যায়
দুই চেতনার মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি যেন খুব স্বচ্ছলতা পায়।'

সেই অতিচেতনার দীপ্তিতে কবি অনুভব করতে পারেন আপন সত্তার দীর্ঘ প্রসারণ—বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত এক কায়া, এমনকি নিজেই যেন 'একা এই আলো, ব্যোম ও সময়।' সেই অতি-চেতনাই তো সুদূরের টান: 'কোনো সুদূরের টানে এত বিচলিত হই, উন্মাদিত হ'য়ে উঠি আমি'। সেই অতিচেতনার দ্বারাই কবি সকল জ্ঞানকে একত্রে

পুঞ্জীভূত হয়ে দণ্ডাকারে রূপ পেতে দেখেন, যার নাম দেন তিনি 'জ্ঞানদণ্ড' :

'আমাদের জ্ঞানদণ্ডে এক প্রান্ত শুদ্ধতম গণিত নামক শাস্ত্র আর
অন্য প্রান্ত আমাদের সকলের পরিচিত কবিতা ও কাব্য—কাব্যগুলি।'

২

গণিত আর কবিতা এইভাবে এই কবির ভাবনায় প্রায় সমগোত্র পেয়ে যায়। গণিতের সংজ্ঞা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় তাঁর কবিতায়, এমনকি কোথাও-কোথাও যুক্তিক্রম সাজিয়ে দেন প্রায় যেন গাণিতিকেরই ধরনে ; সাজিয়ে তোলেন বিমূর্ত সব চিন্তা। কবিতায় এত বিমূর্ত ভাবনার অবতারণা কি কবিতার পক্ষে হানিকর নয়—প্রশ্ন তুলতে পারেন অনেকেই। বিমূর্ত ভাবনাজাত বহু বিবৃতি ছড়িয়ে আছে এ কাব্যগ্রন্থে যেগুলি আদৌ ছন্দ-বিবৃতি নয়। অথচ, বিজ্ঞান বা দর্শনের কথা যতই বলুন না কেন কবি, তাঁর চিন্তার সারবত্তা তো কল্পনারই ভিতর থেকে পাওয়া, কবিতা-জননের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। সুধীন্দ্রনাথ যেভাবে কবিতায় বিজ্ঞান বা দর্শন-প্রসঙ্গকে স্থান দেবার কথা ভাবছিলেন—'শুধু প্রেম-বেদনা ও প্রকৃতিকে নিয়েই কাব্যের কারবার চলে না, তার লোলুপ হাত দর্শন-বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে।' তার থেকে কতই না ভিন্ন স্বাদের এই কবির বিমূর্ত ভাবনা, ভাবনার যুক্তি-নিচয়। বিমূর্ত ভাবনার দিক থেকেই এ কবিতা-বই কারো কারো প্রিয় হতেও পারে। বিমূর্ত যুক্তি দেবার তিলমাত্র ক্ষমতা নেই যে কবির, কবি হিসেবে তিনি কোনো স্বাক্ষর রেখে যান না পিছনে—ভালেরির মতো কবি তো এতদূরেও মনে করেন।

দর্শন-ভাবনার কথা যখন বলেন কবি, তখন তা তাঁর নিজস্ব ভাবনাই, কোনো দর্শন-গ্রন্থের পাতা থেকে উঠে-আসা নয়। ভাবনার সূত্রটি নিজেই বিবৃত করেন কবি : 'শতকরা একেবারে একশত ভাগ খাঁটি দর্শনের নাম / সংজ্ঞা অনুসারে ধর্ম…'। সেই সূত্র অনুসারেই অনেক ফুলের দৃশ্য থেকে কবি দেখেন : 'হয়তো বা ফুলও নেই, বিকশন আছে শুধু বিকশন আছে।' ক্রমাগতই তাঁর ভাবনায় উঠে আসতে থাকে বস্তুর নাম থেকে তার ধর্ম—সারাংসার : পাখি নয় পাখিত্ব, তারা নয় তারাত্ব :

ক. '…পাখিত্ব তো পাখি নয় সেহেতু বিরাট হ'য়ে থাকে,
সেহেতু বিশাল হয় সকল পাখিত্ব আর ছাড়া ছাড়া পাখিগুলি তার
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গমাত্র নানাভাবে নড়ে-চড়ে, নানা জায়গায় নড়ে-চড়ে।'

খ. 'আসলে একটি শুধু তারাত্ব রয়েছে বিশ্বে, একটিই তারাদেহ আছে
সকল তারার যোগে, যোগফলে ; মাঝখানে ফাঁকগুলি কিছু স্বাধীনতা।'

এসব ভাবনা মনে হতে পারে দার্শনিকেরই ভাবনা। একজন দার্শনিক কি মূর্ত থেকে বিমূর্তে পৌঁছিয়েই থেমে যান না ? কবির কল্পনাপ্রতিভাই পারে বিমূর্তকে মূর্তি দিতে, পাখিত্ব বা তারাত্বকে দেহ দান করতে। 'পাখিদের থেকে সব পাখি জন্মে, আলোকের থেকে জন্মে সকল আলোক'—এই পংক্তির প্রথম অংশটি একটি সাধারণ বিবৃতি, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি তেমন নয় ঠিক। অথচ এ তো ছন্দ-বিবৃতিও নয়, তবুও

এ অনাধারণ কবি-দৃষ্টিরই পরিচয়। তার পরের পংক্তিগুলিতে যুক্তি-পরম্পরা চলে আসছে এইভাবে :

'এর বিপরীতভাবে, পাখি যদি ম'রে যায় তবু সেই মৃতদেহ পাখি,
গাছ যদি মরে তবে যা থাকে তা—তাও গাছ, মৃত ব'লে অন্য কিছু নয়।
সেইভাবে আমাদের মন ম'রে গেলে পরে যা থাকে তা—তাও মন মৃত্যুর নিয়মে।'

—সাদৃশ্যের সিঁড়ি বেয়ে যুক্তির এ আরোহণও তো মূলত কবিরই, বৈজ্ঞানিকের নয়। বিজ্ঞানের নিয়মাবলি দিয়ে জ্ঞানে পৌঁছনোর পথটি বুদ্ধির পথ। কিন্তু কবি তাঁর সত্যকে খোঁজেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত শরীর দিয়ে। তিনি জানেন—'সকল শরীর তার প্রতি অংশ দিয়ে ভাবে, ভাবনা ছড়ায় / মাথায় মোটেই নয়, মাথা বাদ দিয়ে বাকি অবয়বময়।' চিন্তাগুলিও তাঁর কাছে অবয়বময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বাস্তব। জ্ঞানের ভিতর থেকেও তাই কবি মদ অথবা মধু নিষ্কাশন করে নিতে পারেন।

কিন্তু জ্ঞানের অধিকার তো শুধু মানুষেরই? চিন্তার অধিকার তো শুধু মানুষেরই? —এ হল বাইরের জগতের সত্য। কবির অন্তর্জগতে ঝর্ণার জলেরও চিন্তাক্ষমতা আছে, রোদের টুকরোগুলিও 'ডুবে-ডুবে কোন কথা ভাবে'। না, এ সমাসোক্তির প্রাবল্য নয়, প্রতীকের রাজত্বও নয়। এ কাব্যের ফুল, পাহাড়, মোহানা বা সপ্তর্ষি বীজগণিতের রাশিমালা নয়। 'চাঁদ চুপে ডুবে যায় -দ্বাদশীর হ'তে পারে, কোথায় কোটরে/প্যাচা ডেকে ওঠে যেন একা-একা ডেকে ওঠে আমোদের ঘোরে'-এসব পংক্তি বড়ো বেশি জীবনানন্দীয় ঠিকই, কিন্তু জীবনানন্দের চাঁদ অথবা প্যাচা অনেকার্থের ব্যঞ্জনাঘন, আর এ কাব্যের চাঁদ নিছক চাঁদই, প্যাঁচা নিছক প্যাচাই। কেবল, দৃশ্যগুলির জন্ম হয় কবির অন্তর্জগতেই, বহির্জগতে এইসব ফুল পাহাড় মোহানা বা সপ্তর্ষির কোনো অস্তিত্বই নেই।

৩

কিন্তু কেন শুধু ফুলের সঙ্গে, তারার সঙ্গে, পাহাড়ের সঙ্গে কিংবা মোহানার সঙ্গেই কথা-বলাবলি চলে কবির, কেন কোনো মানুষের সঙ্গে নয়? 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'—এ কি সব কবিরই কথা নয়? হ্যাঁ, শুধু কবিই বা কেন, মানুষ মাত্রেই তো চায় মানুষের সঙ্গ। চায়, কিন্তু এ সভ্যতায় তা কি সম্ভব আর? মানুষে মানুষে কোনো সত্য সম্বন্ধ গড়ে-ওঠা কি সম্ভব আজও? বড়ো বেদনার সঙ্গেই কবিকে বলতে হয় :

'যে কোনো সময়ে কোনো একদল যুবক ও যুবতীর সাথে
ভাব থাকে, খুব বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বই হয়েছে আমার।
যেই ভাবা শুরু করি, এদের সহিত সখ্য, অন্তরঙ্গ ভাব
জীবনের শেষ দিন অবধিও রয়ে যাবে তখনই হঠাৎ
সেই পুরো দলটাই ভেঙে যায়, কে কোথায় যেন চলে যায়;'

মাত্র একবার নয়, বারবারই এরকম ঘটে জীবনে—পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি দিয়ে বোঝাতে চান কবি। এ হল 'জীবনের নিয়মবিশেষ'—'যা কেউ বিশ্বাস করে অনায়াসে মেনে নিতে কখনো পারে নি'। তবু মেনে নিতে হয়। যদি কারো জীবনে সম্বন্ধের অভিজ্ঞতাই না থাকে কোনো, তাহলে তার যে একাকিত্বের বোধ, তার মধ্যে হতাশা থাকলেও তা সাময়িক বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু কারো জীবনে যদি সম্বন্ধের অভিজ্ঞতাগুলি একটি-একটি করে না হয়ে যায়, তবে তার নিঃসঙ্গতার বোধ চূড়ান্ত, চিরকালীন নিরাশা। আজ যদি আমার কথা বলার কেউ না থাকে, তবে আশা রাখা যায় পরে হয়ত পাওয়া যাবে কথা বলার মানুষ। কিন্তু যদি দেখি যাদের কাছে আমি কথা বলছি, তারা কেউ বুঝছে না কিছু, কিংবা না-বোঝার ভান করছে, তাহলে কি নিরাশ্বাস দুঃসহ হয়ে ওঠে না? তারই আক্ষেপ রয়েছে এই কাব্যে :

'কেন যে আমার কথা—বাজপাখি হ'য়ে আমি সমতলে নেমে গিয়ে যত
কথা বলি উড়ে উড়ে পূর্ণিমার জোছনায় একা-একা কত কথা বলি,
বলি সমতলে যত মানুষ রয়েছে সেই তাদের নিকটে ডেকে-ডেকে
অনেক গভীর রাতে চাঁদের আলোর নিচে, তারার আলোর নিচে একা
তালে তালে ডানা নেড়ে পউষে গভীর রাতে অনেক কবিতা বলে আসি।
কেন যে আমার কথা কিছুই বোঝে নি এই ভান করে, ভান করে থাকে।
রাত শেষ হলেও তো—সকালেও দুপুরেও—ভান করে কিছুই বোঝে নি'।

তাহলে আর কী করতে পারে একজন? তাহলে তো সান্ত্বনা পেতে হয় এই ভেবে যে মানুষ না বুঝে বুঝুক, পাহাড়, চূড়া কিংবা মালভূমি হয়ত বুঝবে! চেতন-অচেতন জ্ঞান সরিয়ে দেবার জন্যেই তখন বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্জগতে আশ্রয় নিতে হয়—'নিজে নিজে খুশি থাকা, পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়ে থাকা আত্মগরিমা' নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে! সে অন্তর্জগতে তো কথা বলার কথা শোনার কোনো আধারের অভাব ঘটে না কখনো, সেভাবেই এই কবি বকুল কিংবা ক্রিসেনথিমামের সঙ্গে সখ্য পাতান, অত্রি-অরুন্ধতীর সঙ্গে কথা বলেন, শূন্যতাকে 'খেয়ে' ফেলেন :

'মোহানায় ঢুকে যাই, একা-একা গান গাই, মোহানার শূন্যতাকে খাই
রোজ একা-একা খাই, সকল শূন্যতা আমি একা-একা ভ'রে ফেলে খাই;

'সকল শূন্যতা আমি একা-একা ভ'রে ফেলে খাই'—এ বাক্যাংশের ক্রিয়াপদ মুখের ভাষা থেকেই তুলে নেওয়া কিন্তু প্রতিদিনের কথ্য গদ্য থেকে বাক্যাংশটি কতই না পৃথক! 'সব কিছু পেকে যায়, পেকে যায় এই সেতু, সুবাতাস, ফুল/কেশর, পরাগ, জোছনা'—'পেকে যায়' ক্রিয়াপদটি বড়ো বেশি চলিত ক্রিয়াপদ, কিন্তু এ বাক্যে এর প্রয়োগ আদৌ প্রচলিত প্রয়োগ নয়। 'বিশাল দুপুরবেলা চারিদিকে ফুটে আছে, ফুটে আছে আকাশে আকাশে'—এ পংক্তির 'ফুটে আছে' কিংবা 'খসাগুলি অথবা উপরে ওঠাগুলি / না হলে চলে না'—এর 'খসাগুলি' 'ওঠাগুলি'—এ সবই চলিত এবং অতিসাধারণ ক্রিয়াপদের অচলিত এবং অসাধারণ প্রয়োগ। এসব প্রয়োগ অবশ্যই কোনো শব্দ-

চাতুর্যের পরিচয় দেয় না। এ কাব্যের ভাষায় এমনকি উপমা-উৎপ্রেক্ষারও কোনো অলংকরণ নেই। একান্ত নির্ভার সরল কথ্য ভাষা, তবু কথ্য ভাষা থেকে কত পৃথক, তবু তা কবিতারই ভাষা। যাকে বলা যেতে পারে কাব্যিক ভাষা—তার থেকে এ ভাষার গোত্র আলাদা, মুখের ভাষার সঙ্গে এর গোত্রগত মিল আছে ঠিকই, তবু মুখের ভাষা, হাট-বাজারের ভাষার সঙ্গেও এর অমিল রয়ে গেছে। অমিল রয়ে গেছে, তার একটা কারণ, এ ভাষাতে কোনো চলিত বাগ্‌ধারা নেই। বাগ্‌ধারায় সঞ্চিত থাকে সামাজিক উত্তরাধিকার, সমাজ থেকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই কবি সে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেননি। মুখের ভাষার সারল্য, ভারহীনতা অব্যাহত রেখেও ভাষা কতদূর ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে পারে কবিতার রহস্যজগৎ রচনা করতে পারে, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' তারই এক দৃষ্টান্ত।

ছন্দের দিক থেকেও, কোনো অভিনবত্বের, কোনো কলাকৌশলের প্রয়াস নেই এ কাব্যে, জীবনানন্দের ব্যবহারচিহ্নিত দীর্ঘপয়ারই এ কাব্যের অবলম্বন। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ, অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে—এই শুধু বৈচিত্র্য। 'পংক্তিগুলি যত বেশি দীর্ঘ করি পাঠকালে তত বেশি ধীরগতি হয়'—ধীরগতি চেয়েই কি পংক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ থেকে অতিদীর্ঘ হয়ে উঠেছে—প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বাইশ, তার পরের দুটিতে ছাব্বিশ তার পরেরটিতে ত্রিশ হয়েছে মাত্রাসংখ্যা ?

ধীরগতি চেয়েই, কিন্তু শুধু এইটুকু নয়। মনে হয় গোটা বই জুড়ে একটি নদীর ছবি আঁকতে চেয়েছেন কবি। নদী যেমন যতই মোহানার দিকে এগোয়, ততই তার বিস্তার বাড়ে আর স্রোত কমে, সেইভাবেই এ কাব্যের ধ্বনি-ধারা ক্রমশ বিস্তার পেয়েছে, গতি কমেছে। যেন বা নদীর ছবিকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই চেয়েই স্তবক বা পদ্য-অনুচ্ছেদ এ কাব্যে অনুপস্থিত। পৃথক-পৃথক বহু ভাবনা এসেছে এ কাব্যে, কিন্তু অনুচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেনি। নদীর জলধারার উপর যেমন প্রহরে-প্রহরে নানা রঙ, আলো-ছায়ার নানা খেলা আসে যায়, সেভাবেই এ কাব্যে নানারঙা ভাবনা-কল্পনা কোলাজ রচনা করে চলেছে। কবি জানেন অবশ্যই 'ভাব আর অবয়ব—এ-দুটিকে কোনক্রমে পৃথক, বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব ব'লে / ও-দুটি প্রকৃতপক্ষে দুই নামে এক বস্তু, কেবল অদৃশ্য ব'লে ভাবা হলে ভাব / আর দৃশ্য বলে যদি ভাবো তবে অবয়ব।'—তাই বলা যায়, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র অবয়ব কবির অন্তর্জগতেরই অবয়ব। সে অবয়ব ভাস্কর্য নয়, গান; কুদে-তোলা নয়, বয়ে-যাওয়া; অ্যাপোলোনীয়ান নয়, ডায়োনিসিয়াক।

অন্তর্জগতের কাব্য বলেই 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র স্বাদ আজও টাটকা। কবিতা-সংসারে আজ যখন দেখি বহির্জগতেরই দাপট, যে বহির্জগৎ সাপলুডোর ছক, দেখি তার মধ্যে ঘুটিগুলির চাতুর্যময় বিবরণ, তখন এরকম অন্তর্জগতের কবিতা গুমোটের মধ্যে স্নিগ্ধ হাওয়ার মতো মনে হয়। □